বামনের চন্দ্রাভিলাষ !

বিমান নাথ

বি জ্ঞা ন

ভারতের মহাকাশবিজ্ঞানী মহলে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। যদি সব কিছু প্ল্যানমাফিক হয়, তাহলে চার-পাঁচ বছরের মধ্যে চাঁদের চারিদিকে ঘুরপাক খাবে ভারতে তৈরি এবং ভারতবর্ষ থেকে পাঠানো 'চন্দ্রযান-১'। সবাই অবশ্য এ নিয়ে খুব একটা উৎসাহিত নন। কেউ বলছেন এত খরচ করে চাঁদে যাওয়া কি আমাদের মতো গরিব দেশের মানাবে? আবার কেউ ভাবছেন 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো'— চাঁদ নিয়ে জানার আর কী বাকি রয়েছে? নীল আর্মস্ট্রং আর অন্যান্যরা তো সেই কবেই সব কিছু দেখে, পরীক্ষা করে, এমনকী চাঁদের পাথর-মাটি পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে এলেন।

অনেকেরই মনে হতে পারে যে, এক দিকে বিশাল মহাবিশ্ব এবং অন্য দিকে পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আচরণ ছাড়া আর কিছুই আমাদের জানার বাকি নেই। চাঁদ নিয়ে গবেষণা তো সেই মান্ধাতার আমলের ব্যাপার। আর মহাকাশেই যদি যাবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে চাঁদ কেন, আজকাল তো মঙ্গল গ্রহ নিয়ে খুব জল্পনাকল্পনা চলছে, গেলে কি সেখানেই যাওয়া উচিত নয়? চাঁদ তো আমরা স্কুলেই পড়েছি একটা রুক্ষ শুষ্ক মরুভূমির মতো জায়গা। যেখানে বাতাস নেই, জল নেই। আর চাঁদ থেকে আনা পাথর-মাটি বিশ্লেষণ করে তার সমস্ত উপাদান নিশ্চয় জানা হয়ে গেছে, জানা গেছে তার জন্মবৃত্তান্ত।

কিন্তু সত্যিই কি আমরা চাঁদ নিয়ে সব কিছু

কেউ বলছেন
এত খরচ করে চাঁদে যাওয়া কি আমাদের মতো গরিব দেশের মানাবে? আবার কেউ ভাবছেন 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো'— চাঁদ নিয়ে জানার আর কী বাকি রয়েছে?

জানি? মহাকাশযান নির্মাণ এবং উৎক্ষেপণের খরচপত্রের হিসাব না হয় পরে করা যাবে— প্রথমে দেখা যাক চাঁদ নিয়ে নতুন কোনও গবেষণার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না।

সত্যি কথা বলতে কী, চাঁদের উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। শুনলে অবাক লাগতে পারে, কিন্তু আমাদের যে এই ভুবনের সোম, তার জন্ম এখনও রহস্যে মোড়া। এই ব্যাপারে একটা সহজ পরীক্ষার কথা প্রথমেই মনে আসে। যদি পৃথিবী থেকে চাঁদের উৎপত্তি হয়, তাহলে তাদের উপাদান একই হওয়া উচিত, এবং তাহলে পৃথিবী ও চাঁদে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে একই অনুপাত থাকা চাই। যদিও অনেক ক্ষেত্রে চাঁদের পদার্থের সঙ্গে পৃথিবীর পদার্থের মিল রয়েছে, তবু বেশ কিছু পদার্থ পৃথিবী ও চাঁদে বিসদৃশ অনুপাতে বর্তমান। কিছু কিছু পদার্থের বেলায় মনে হয় চাঁদের উৎপত্তি হয়েছিল পৃথিবী থেকেই অথবা পৃথিবীর নিকটবর্তী কোনও জায়গায়, যেখান থেকে সে পৃথিবীর মহাকর্ষের বাঁধনে ধরা পড়েছে। আবার অন্য অনেক উপাদানের ক্ষেত্রে চাঁদ আর পৃথিবী এত বিসদৃশ যে এদের উৎপত্তি কোনওভাবে একে অপরের সঙ্গে জড়িত বলে মনেই হয় না।

এক দিকে চাঁদের মোট ঘনত্ব পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম— কারণ চাঁদে লোহার পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় কম। সহজে বাষ্পীভূত হয় এমন পদার্থও— যেমন জল, পটাসিয়াম— চাঁদে তুলনামূলকভাবে কম। পৃথিবী থেকে চাঁদের উৎপত্তি হলে এমনটি নিশ্চয় হত না। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য উপগ্রহের সঙ্গে তুলনা করলেও তাই মনে হয়। সৌরমণ্ডলে উপগ্রহ এবং গ্রহের ভরের মোটামুটি একটা অনুপাত রয়েছে— উপগ্রহগুলি তাদের হাজার ভাগের এক ভাগ বা আরও কম ভারী। আমাদের চাঁদ সেই তুলনায় কিন্তু বেশ বেঢপ ধরনের মোটা; তার ভর পৃথিবীর শুধু একশো ভাগের এক ভাগ। এইসব লক্ষণ থেকে বিজ্ঞানীরা প্রথমে মনে করেছিলেন যে চাঁদ সৌরমণ্ডলের এই অঞ্চলে কখনও এক অনাহূত অতিথির মতো এসেছিল যা কোনও কারণে পৃথিবীর মহাকর্ষের পাশে ধরা পড়েছে।

অন্য দিকে অ্যাপোলো অভিযানের সময় আনা চাঁদের পাথরের উপাদান প্রায় পৃথিবীর মতো পাওয়া গেছে। যেমন অক্সিজেনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে অনুপাত। অক্সিজেনের পরমাণুর কেন্দ্রে সাধারণত আটটি প্রোটন এবং আটটি নিউট্রন থাকে। নিউট্রনের কোনও বৈদ্যুতিন চার্জ নেই, তাই পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রনের সংখ্যার রকমফের হলে তার রাসায়নিক ধর্ম পালটায় না, সেটা অক্সিজেনই থেকে যায়, শুধু তার ভর হয় খানিকটা কম বা বেশি। এই ভারী ও হালকা অক্সিজেন বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে মিশে থাকে। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই অনুপাত সমান হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। বিজ্ঞানীরা তাই অবাক হয়েছিলেন যখন তাঁরা চাঁদের মাটিতে হালকা ও ভারী অক্সিজেনের অনুপাত পেলেন পৃথিবীর মতোই। একে কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

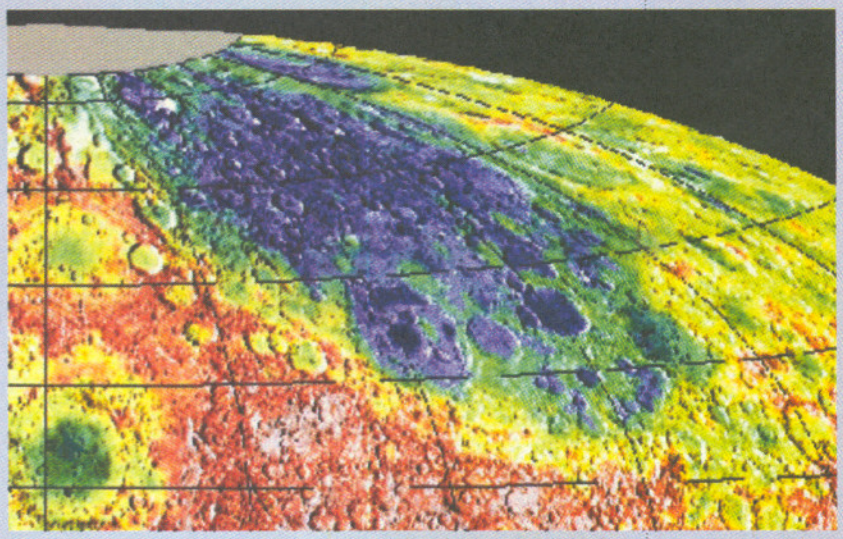

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে রহস্যময় অ্যাইটকিন অঞ্চল (নীল রঙে চিহ্নিত)

প্রায় পঁচিশ বছর আগে (নিল আর্মস্ট্রং-এর চাঁদে যাওয়ার অনেক পরে) বিজ্ঞানীরা তাই একটি নতুন তত্ত্ব নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। পৃথিবী থেকে আপনাআপনি বেরিয়ে নয়, পৃথিবীর সঙ্গে কোনও বড় কিছুর এক বিপুল

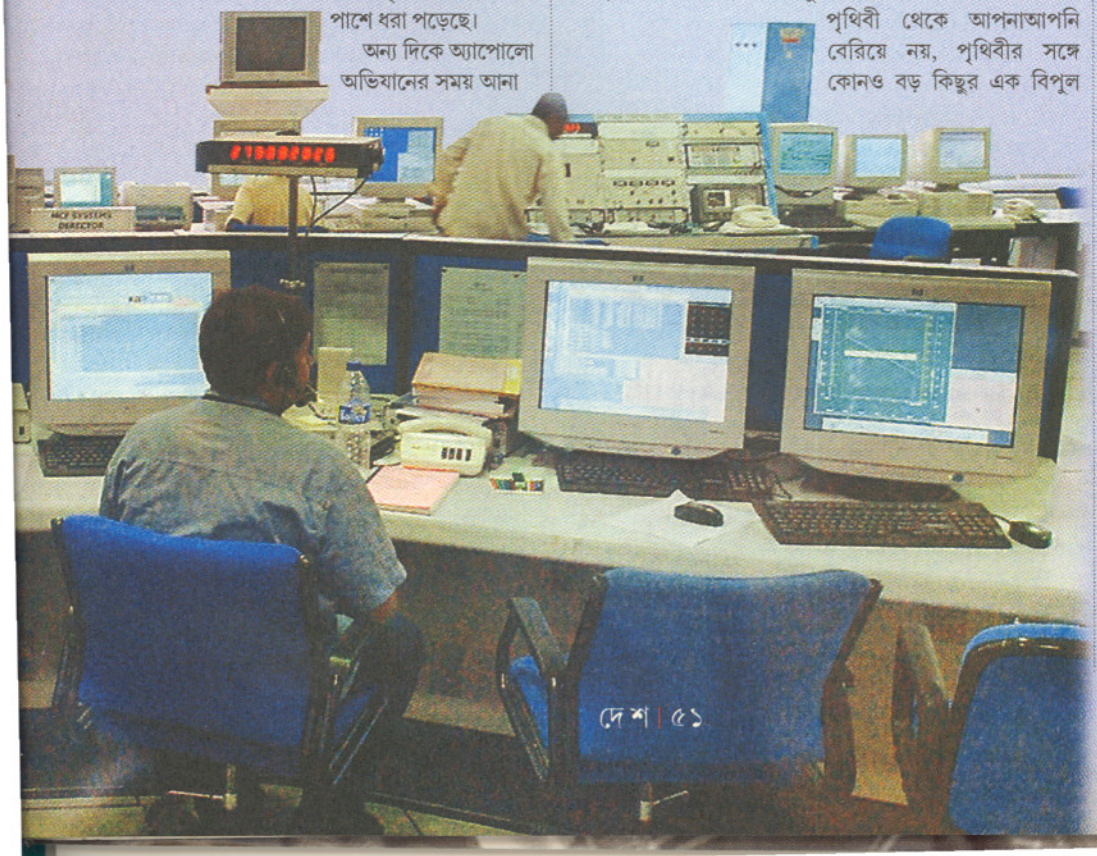

কিন্তু সত্যিই কি

আমরা চাঁদ নিয়ে সব কিছু জানি? সত্যি কথা বলতে কী, চাঁদের উৎপত্তি নিয়েই বিজ্ঞানীরা এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

সংঘর্ষের ফলে তৈরি হয় চাঁদ। এই সংঘর্ষের পর পৃথিবীর বাইরের স্তরের খানিকটা অংশ মহাকাশে ছিটকে পড়েছিল, যা কয়েক দিনের মধ্যে একত্রিত হয়ে চাঁদে পরিণত হয়। যেহেতু পৃথিবীর বাইরের স্তরে লোহার পরিমাণ কম— বেশির ভাগ রয়েছে পৃথিবীর কেন্দ্রে— তাই চাঁদে লোহার পরিমাণ কম। এই সংঘর্ষে তাপমাত্রাও নিশ্চয় খুব বেশি হয়েছিল, এবং তাই পটাসিয়াম, জল ইত্যাদি সহজে বাষ্পীভূত পদার্থও চাঁদে কম পরিমাণে আশা করা যায়। অনেকের ধারণা এই মারাত্মক ধাক্কাতেই পৃথিবীর অক্ষরেখা হেলে যায়, যার ফলে শুরু হয় ঋতু পরিবর্তনের পালা।

শিল্পীর কল্পনায় চাঁদের জন্মমুহূর্ত : পৃথিবী ও আগন্তুক গ্রহাণুর সংঘর্ষ

মহাকাশে এমন বিরাশি সিক্কার চড় খাওয়ার ঘটনা খুব বিরল— তাই চাঁদের মতো উপগ্রহও সৌরমণ্ডলে একমেবাদ্বিতীয়ম; এর বৈশিষ্ট্যগুলিও অনন্য। অর্থাৎ, খুব বরাতজোরে পৃথিবী চাঁদের মতো একটি উপগ্রহ জোগাড় করেছে (যদিও এর জন্য তার ঘাড় চিরদিনের মতো কাত হয়ে গেছে); নয়তো এমন একখানা 'চাঁদ' জোগাড় করা পৃথিবীর মতো মধ্যভরের কোনও গ্রহের পক্ষে সহজ হত না।

কিন্তু এই প্রকল্প নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এই কাল্পনিক সংঘর্ষের সময় সৌরমণ্ডলের এই অঞ্চলে আরও অনেক গ্রহাণু (বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, গ্রহিকা) ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এখন পর্যন্ত এই সংঘর্ষের অঙ্কে এদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হয়নি।

জন্মরহস্য ছাড়াও চাঁদ নিয়ে আরও অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে বিজ্ঞানীদের মনে। যেমন, চাঁদের দৃশ্য এবং অদৃশ্য পিঠের চেহারা এত ভিন্ন কেন? চাঁদের যে অংশ আমাদের দিকে মুখ করে থাকে, তাতে রয়েছে অনেকগুলি কালো রঙের 'Mare' বা 'সাগর'; কিন্তু তার উলটোপিঠে তেমন বড় কোনও সাগর নেই। কিছু বিজ্ঞানীর মতে পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকা অংশে এককালে লাভা বেরিয়ে এসে আগেকার গহ্বরগুলি ঢেকে দেয় এবং কালো 'সাগর' সৃষ্টি করে। হয়তো এই অংশটি পৃথিবীর গা-গুলানো মহাকর্ষের পাল্লায় পড়ে লাভা-বমির ফলে এক বিচ্ছিরি রূপ নিয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এ নিয়ে অনেকের সন্দেহ রয়েছে।

প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার ব্যাসের এবং প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীর এই অঞ্চলের নাম রাখা হয়েছে অ্যাইট্‌কিন্‌ অঞ্চল। 'নাসা' এখানেই পেয়েছে জলের (বরফের) সন্ধান।

চাঁদের আর একটি বড় রহস্য হল তার দক্ষিণ মেরুর অ্যাইট্‌কিন্‌ অঞ্চল নিয়ে। সত্যি কথা বলতে চাঁদের মানচিত্র এখনও পুরোপুরি আঁকা হয়নি। বৃহস্পতির দিকে রওনা দেবার আগে গ্যালিলিও মহাকাশযানটি ১৯৯২ সালে একবার চাঁদের পাশ দিয়ে যায়। তখন বিজ্ঞানীরা চাঁদের উলটোপিঠে একটি বিশাল গহ্বরের ছবি দেখতে পান। প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার ব্যাসের এবং প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীর এই অঞ্চলের নাম রাখা হয়েছে অ্যাইট্‌কিন্‌ অঞ্চল। বিজ্ঞানীদের মতে যে গ্রহাণুটির ধাক্কায় এই গহ্বর সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা ১০০০ কিলোমিটারের চেয়েও বড় আকারের ছিল, এবং তাঁদের অঙ্ক অনুযায়ী এমন ধাক্কা চাঁদের পক্ষে সামলানো মুশকিল। তাহলে এমন একটি গহ্বর সৃষ্টি হল কীভাবে? এই অঞ্চল নিয়ে তাই জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। 'নাসা' ইতিমধ্যে দুটি মহাকাশযান পাঠিয়েছে এই অঞ্চলের বিশদ ছবি তুলে আনার জন্য। এবং তারা এখানেই পেয়েছে জলের (বরফের) সন্ধান।

সবচেয়ে অবাক হতে হয় একটি কথা ভেবে। চাঁদের বড় গহ্বরগুলি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে আজ থেকে ৩৮০-৪২০ কোটি বছর আগে সৌরমণ্ডলের বহু বড় বড় গ্রহাণু চাঁদকে ঘনঘন আঘাত করেছিল। চাঁদের তুলনায় পৃথিবীর মহাকর্ষ অনেক শক্তিশালী। তাই পৃথিবীর ওপর নিশ্চয় এই ধরনের আঘাত চাঁদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি এসেছে। অন্য দিকে আজ থেকে ৩৮০ কোটি বছর আগেই পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল বলে ধারণা। এমন ঘনঘন চড়চাপড় খাওয়ার ফলে তো পৃথিবীর সাগর এবং আবহাওয়া অত্যন্ত তপ্ত হয়ে ওঠার কথা। তাহলে প্রশ্ন জাগে এই প্রতিকূল পরিবেশে কীভাবে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল?

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য চাঁদের গহ্বরের আরও বিশদ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এদিক দিয়ে ভাবতে গেলে চাঁদ একটি বিশাল স্মৃতিফলকের মতো। যে মারাত্মক সময়ের প্রায় কোনও চিহ্নই পৃথিবীতে নেই, কারণ এখানকার জল বাতাস তাকে ধুয়ে মুছে বিলীন করেছে— সেই সময়কার চিহ্ন চাঁদের গায়ে রয়েছে অটুট, অক্ষত। বিশেষ করে চাঁদের উলটোপিঠে, যেখানে তপ্ত লাভার প্লাবনে ক্ষতগুলি ঢাকা পড়েনি। আরও বিশেষ করে তার প্রায় অনালোকিত মেরু অঞ্চলে, যেখানে সূর্যরশ্মিও কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। সেখানকার ক্ষতচিহ্নগুলি এখনও নীরবে নিভৃতে বয়ে বেড়াচ্ছে আদিকালের ভয়ঙ্কর স্মৃতি।

চাঁদের মেরু অঞ্চলে বরফের চিহ্ন বিজ্ঞানীদের আর একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। দিনের বেলায়, অর্থাৎ চাঁদের সূর্যালোকিত অংশের তাপমাত্রা পৌঁছয় প্রায় ১৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর তার অন্ধকার অঞ্চল হয় হিমশীতল, যেখানে তাপমাত্রা দাঁড়ায় প্রায় -১৭০ ডিগ্রি। তাই চাঁদের আলোকিত অঞ্চল থেকে নানান পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে অন্ধকার অঞ্চলে জমা হয়। হয়তো এমনি করে চাঁদের সমস্ত জল ক্রমশ তার মেরু অঞ্চলে ঠাঁই নিয়েছে। চাঁদে যদি ভবিষ্যতে মহাকাশবিজ্ঞানের গবেষণার কোনও কেন্দ্র গড়ে তুলতে হয়, তাহলে এই বাষ্পীভূত পদার্থের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছনোর ব্যাপারটা ভালভাবে জানতে হবে।

ভারতের মেরুকক্ষ উৎক্ষেপণ যান

এই ব্যাপারে কিছু তেজস্ক্রিয় গ্যাসের নিরীক্ষণ সাহায্য করতে পারে। ডাক্তাররা প্রায়ই রোগনির্ধারণের জন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করেন। যেমন ক্যান্সারে আক্রান্ত থাইরয়েড পরীক্ষা করতে তাঁরা তেজস্ক্রিয় আইওডিন ব্যবহার করেন, যার থেকে বিকিরিত রশ্মির সাহায্যে বোঝা যায় কীভাবে থাইরয়েডে আইওডিন প্রবেশ করছে। চাঁদের ক্ষেত্রে তেমনই ব্যবহার করা যেতে পারে রেডন (Radon) গ্যাস, যা তেজস্ক্রিয় এবং চাঁদের তপ্ত অঞ্চলগুলি থেকে বেরিয়ে ক্রমাগত শীতল অংশের দিকে সরে যায়। যাওয়ার পথে এই গ্যাস তার তেজস্ক্রিয়তার ফলে ক্রমশ সিসায় পরিণত হয় (সাধারণ সিসা নয়, তার এক ভারী তেজস্ক্রিয় রূপ)। এই রূপান্তরের সময়ের মাপকাঠি জানা

আছে বিজ্ঞানীদের। তাহলে চাঁদের পিঠে রেডন ও সিসার বিস্তৃতি নিরীক্ষণ করে জানা যাবে সহজে বাষ্পীভূত পদার্থ কীভাবে এবং কতটুকু সময়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। হয়তো তখন জানা যাবে চাঁদের পিঠে কীভাবে জল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছেছে।

বিজ্ঞানীরা তাই চাঁদের এইসব স্বল্পপরিচিত অঞ্চলগুলি খতিয়ে দেখতে প্রায় উঠেপড়ে লেগেছেন। অ্যাপোলো অভিযানের পর গত ত্রিশ বছরে প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। যেমন, তখন ডিজিটাল ক্যামেরার প্রযুক্তি ছিল না, যা এসেছে আশির দশকে (এবং যা জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিপ্লব এনেছে; আজকাল তো সহজেই কিনতে পাওয়া যায়)। এর ফলে 'অ্যাপোলা'-র সময়কার তুলনায় আরও সূক্ষ্মভাবে চাঁদের পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। চাঁদের পিঠে নামারও দরকার নেই, চাঁদের ওপর থেকে পর্যবেক্ষণ করেই তার পাথর-মাটির উপাদান সম্বন্ধে অনেক বেশি জানা যাবে। পৃথিবীর চারিদিকে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি যেমন পৃথিবীর ছবি তুলে সেই ছবির বিভিন্ন অংশের রং বিশ্লেষণ করে কোথায় কী খনিজ রয়েছে তার খবর জানতে পারে, তেমনই চাঁদের বেলাতেও করা যেতে পারে। এই 'দূরানুভূতি'র (Remote Sensing) প্রযুক্তিবিদ্যা গত কয়েক দশকে অনেক উন্নত হয়েছে।

গত কয়েক বছরে তাই চাঁদে মহাকাশযান পাঠানোর হিড়িক পড়ে গেছে। ১৯৯৪ সালে 'নাসা'-র পাঠানো 'ক্লিমেন্টাইন' (Clementine) চাঁদের বেশ কিছু উন্নতমানের ছবি পাঠায় (কয়েক মাস পর যান্ত্রিক গোলযোগে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার আগে পর্যন্ত)। ছবিগুলি 'বেনীআসহকলা' রঙের আলো ছাড়াও, অবলোহিত এবং অতিবেগুনি আলোতেও তোলা হয়েছিল। এর সাহায্যে বেশ কিছু ধরনের পদার্থের বিস্তৃতি জানা গিয়েছিল। এতে উৎসাহিত হয়ে ১৯৯৮ সালে 'নাসা' পাঠায় 'লুনার প্রসপেক্টর', যাতে সূক্ষ্ম পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য বেশ কিছু যন্ত্র ছিল। ছিল জলের সন্ধানের জন্য নিউট্রন নিয়ে পরীক্ষা করার যন্ত্র, যার পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞানীরা এখন মনে করেন যে চাঁদের মেরু অঞ্চলে প্রচুর বরফ রয়েছে।

এতদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর চারিদিকে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এতদিনে তাঁরাও বুঝতে পেরেছেন এর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে চাঁদে মহাকাশযান পাঠিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের খরচ অনেক কমে গেছে। তাই ২০০৩ সালে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা পাঠিয়েছেন 'স্মার্ট-ওয়ান' (SMART-1), যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশযানের জন্য জ্বালানি ব্যবহার করার কিছু নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করা। এই মহাকাশযানটি চাঁদের চারিদিকে বছর দুই ঘুরে নানা রঙের আলো, অবলোহিত এবং রঞ্জনরশ্মির সাহায্যেও ছবি তুলবে। তাঁদের মতে চাঁদের মাটির বিভিন্ন উপাদানের সম্যক তথ্য পাওয়া যাবে এই পর্যবেক্ষণ থেকে। পৃথিবীর ধাক্কা খাওয়ার ফলেই চাঁদের জন্ম কি না সেই প্রকল্পও পরীক্ষা করা যাবে।

এই মিছিলে এশিয়ার দেশগুলিও পিছিয়ে নেই। ২০০৪ সালে জাপান পাঠাচ্ছে 'লুনার-এ', যা চাঁদের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে তার ওপর কিছু যন্ত্র ফেলবে যেগুলি সেখানকার ভূমিকম্প, অর্থাৎ চন্দ্রকম্পের তথ্য পাঠাবে। এর কয়েক বছরের মধ্যে পাঠানো হবে Selene, যা চাঁদের খনিজের খোঁজ নেবে। চিনা বিজ্ঞানীরাও ২০১০-এর আগে চাঁদের বিশদ ছবি এবং পাথর-মাটি বিশ্লেষণ করার জন্য একটি মহাকাশযান পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছেন।

বোঝাই যাচ্ছে চাঁদে যাওয়া নিয়ে অনেক দেশই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইতিহাসে যখনই এরকম কোনও নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্তে এসেছে, তখনই প্রথম যে-কয়েকটি দেশ উদ্যোগ নিয়েছে পরে তাদের ছাড়া অন্যদের পক্ষে সেইসব পরীক্ষানিরীক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে ভারতকে তাই চিরকাল সবাইকে কৈফিয়ত দিয়ে যেতে হচ্ছে, আমাদের প্রচেষ্টা শান্তিপূর্ণ হোক আর না হোক। কারণ আমাদের আগে যারা এ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিল তারাই নিজেদের মধ্যে সব নিয়মকানুন ঠিক করে ফেলেছে। সত্তরের দশকে এমনই একটি নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছিল অ্যান্টার্কটিকা অভিযান নিয়ে। ১৯৮১ সালে ইন্দিরা গাঁধীর তৎপরতায় ভারত অ্যান্টার্কটিকায় একটি বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে (প্রথমে 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী' ও পরে 'মৈত্রী')। ভারতকে তাই ১৯৯৩ সালে অ্যান্টার্কটিকা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তির সময় একটি পরমার্শদাতা দেশের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অ্যান্টার্কটিকা যাওয়া এবং সেখানে কিছু করতে যাওয়া নিয়ে নিয়মকানুন ধার্য করার সময় ভারতের মতামত নেওয়া হয়। নইলে এখন সেখানে সামান্য কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে গেলে হাজার ঝুটঝামেলা পোয়াতে হত।

কিন্তু অ্যান্টার্কটিকায় যাওয়া আর চাঁদে যাওয়া কি এক হল? ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কি 'নাসা' আর অন্যান্যদের টেক্কা দিতে পারবেন? গরিব দেশের মহাকাশ নিয়ে গবেষণা বামনের চাঁদ ধরতে যাওয়া বলে বিদেশি পত্রপত্রিকায় যতই ঠাট্টা করা হোক না কেন, মহাকাশবিজ্ঞানে কিন্তু ভারতীয়রা বেশ এগিয়ে রয়েছেন। অনেকেই শুনে অবাক হতে পারেন যে, রিমোট সেন্সিং-এর জগতে ভারতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ব্যবসায়ের দিক থেকেও আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তোলা ছবির প্রচুর নামডাক রয়েছে। ২০০৪ সালের প্রথম দিকে আমেরিকার একটি বাণিজ্যিক সংস্থা ভারতের কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি বিক্রি করার স্বত্বাধিকার কিনেছে। তাদের মতে ভারতীয় উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি অন্যান্যদের ছবিকে সহজে টেক্কা দিতে পারে। আমাদের উপগ্রহ বানানোর খরচ কম হলেও সেগুলি খুব উন্নতমানের।

মহাকাশযান উৎক্ষেপণের ব্যাপারেও ভারত অনেক এগিয়ে রয়েছে। আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে ভারত উৎক্ষেপণ যান তৈরি করা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিল। আজ তাই ভারত বিশ্বের মহাকাশযান উৎক্ষেপণের বাজারেও নজর কাড়ছে। শুধু ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরি উপগ্রহ নয়, ভারতীয় 'মেরুকক্ষ উৎক্ষেপণ যান' ব্যবহার করে ইতিমধ্যে জার্মানি, বেলজিয়াম এবং দক্ষিণ কোরিয়ার

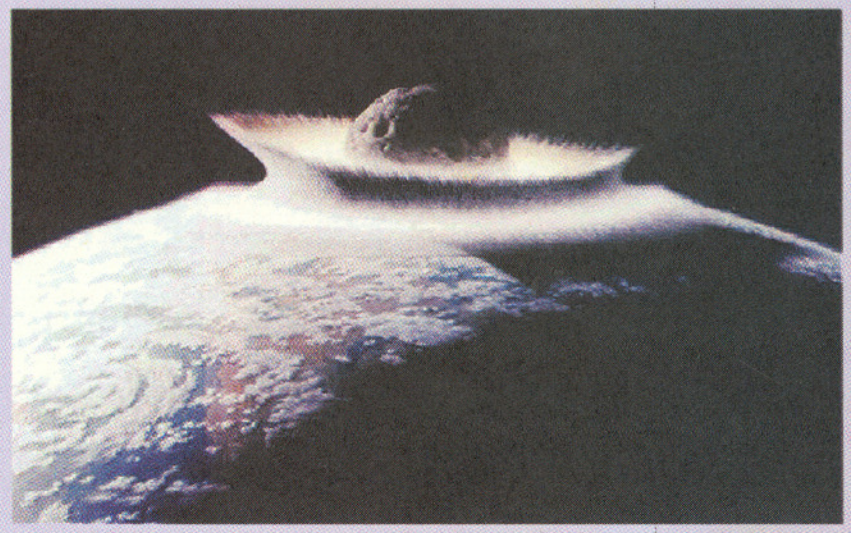

আদিম পৃথিবীর বুকে গ্রহাণুর সংঘর্ষ। এই সময়ের পরিবেশ ছিল প্রাণ সৃষ্টির প্রতিকূল

ভারতীয় উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি অন্যান্যদের ছবিকে সহজে টেক্কা দিতে পারে। এর ব্যবসায়ের দিক থেকেও আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের প্রচুর নামডাক রয়েছে।

উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে ভারত। আগামী বছর ইস্রায়েলে তৈরি একটি কৃত্রিম উপগ্রহ (যা অতিবেগুনি আলোর সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য জোগাড় করবে) পাঠানো হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী উৎক্ষেপণ যানের সাহায্যে। অন্যেরা তো ঠাট্টা করবেই—ভারতীয়দের কোনও রকমে নিরস্ত করতে না পারলে তো তাদের ব্যবসার ক্ষতি।

চাঁদের উলটো পিঠে (ডান দিকে) 'সাগর'-এর বিস্তৃতি অনেক কম

আমাদের বিজ্ঞানীদের পক্ষে এইসব সম্ভব হয়েছে তাঁদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের দূরদর্শিতার জন্য। সতীশ ধাওয়ানের নেতৃত্বে প্রায় তিরিশ বছর আগে এইসব গবেষণা শুরু হয়েছিল। তারও সূত্রপাত সেই পঞ্চাশের দশকে বিক্রম সারাভাইয়ের দূরদর্শিতায়। সে সময় ভারতের মহাকাশ গবেষণার হাতেখড়ি হয়েছিল ছোটখাটো রকেট পাঠানো দিয়ে। কারণ মহাকাশবিজ্ঞানে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে উন্নতির একটাই উপায়—নিজে হাতেনাতে করে দেখে নেওয়া। এরই ফলে আজ আমাদের মহাকাশবিজ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই আমাদের টেলিফোন যোগাযোগের জন্য অন্য কারও সাহায্য নিতে হয় না, যার জন্য দেশের কোথাও ঘূর্ণিঝড় হলে অনেক আগে খবর পাই আমরা, যার জন্য অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকজনও টেলিভিশন দেখতে পারে। এখন তো কর্নাটকের মতো কয়েকটি প্রদেশে উপগ্রহ ব্যবহার করে ডাক্তাররা দূরের রুগিদের রোগ নির্ধারণও করছেন।

শুধু ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরি উপগ্রহ নয়, ভারতীয় 'মেরুকক্ষ উৎক্ষেপণ যান' ব্যবহার করে ইতিমধ্যে জার্মানি, বেলজিয়াম এবং দক্ষিণ কোরিয়ার উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে ভারত।

কয়েক বছর আগে তাই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা চাঁদে যাওয়া নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তাঁরা ভেবেছেন কীভাবে কম খরচে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য জোগাড় করা যায়। তাঁদের মতে সবচেয়ে কম খরচে চাঁদে মহাকাশযান পৌঁছতে হলে সরাসরি কোনও যান না পাঠানোই শ্রেয়। সবচেয়ে ভাল উপায় হল প্রথমে পৃথিবীর চারিদিকে কোনও কক্ষপথে তাকে ঘুরতে দিয়ে, তারপর একটু একটু করে তার দূরত্ব বাড়িয়ে এক সময় চাঁদের মহাকর্ষের আওতায় ফেলে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর মহাকর্ষকে একটা গুলতির মতো ব্যবহার করে এবং খুব বেশি জ্বালানি খরচ না করেই চাঁদে পৌঁছনো যাবে কয়েকদিনের মধ্যে। আর এর জন্য যে ধরনের উৎক্ষেপণ যান প্রয়োজন, সেরকম যান ভারত ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার পাঠিয়েছে।

২০০২ সালে পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় এমনই লম্বাটে ধরনের কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয়েছিল (আবহাওয়ার খবর নেওয়ার জন্য। পরে এর নামকরণ করা হয়েছে 'কল্পনা-১')। শুরুতে চন্দ্রযানের ক্ষেত্রেও এমনই কক্ষপথে একে পাঠানো হবে এবং ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়িয়ে চাঁদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে চাঁদের কাছে পৌঁছনোর পর চন্দ্রযানের সঙ্গে চাঁদের মহাকর্ষের গাঁটছড়া বাঁধার ব্যাপারটা সহজ হবে না। ঠিক সময়ে চন্দ্রযানকে একটু ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিতে হবে চাঁদের দিকে। সময়ের একটু এদিক ওদিক হলে এটি চাঁদে না পৌঁছে মহাকাশের অন্য কোনও দিকে চলে যেতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে চন্দ্রযানকে চাঁদের পিঠ থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরবর্তী এক কক্ষপথে ঘুরতে দেওয়া হবে, এমনভাবে যাতে সে চাঁদের মেরু অঞ্চল ভাল করে নিরীক্ষণ করতে পারে।

একাধারে শিল্পী ও বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্টম্যান চাঁদের জন্মমুহূর্তটি যেভাবে কল্পনা করেছেন

তবে না হয় মেনে নেওয়া গেল ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চাঁদে মহাকাশযান পাঠানোর ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায় আমাদের বিজ্ঞানীরা কি নতুন কিছু তথ্য জোগাড় করতে পারবেন? কোনও নতুন ধরনের পরীক্ষা করতে পারবেন? যা আগে করা হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি করে লাভ কী? মহাকাশে শুধু ট্রাপিজের খেলা দেখিয়ে কী লাভ?

অন্তত একটা ব্যাপারে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নতুন তথ্য পাবেন বলে মনে করছেন। সেটা হল চাঁদ থেকে বিচ্ছুরিত শক্তিশালী রঞ্জনরশ্মির তথ্য। রঞ্জনরশ্মি-জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিশেষ করে শক্তিশালী রঞ্জনরশ্মির ক্ষেত্রে, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটারের দশ থেকে একশো কোটি ভাগের এক ভাগ। (হাসপাতালে যে ধরনের রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার করা হয় তা এর থেকে বেশ দুর্বল।) এই ধরনের রঞ্জনরশ্মি নিরীক্ষণ করার যন্ত্রপাতি বানানো ছাড়াও এর বিশ্লেষণেও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা দক্ষ। কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহে তাঁরা এইসব যন্ত্র পাঠিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পেয়েছেন, যেমন পাওয়া গেছে কয়েকটি কৃষ্ণবিবরের সন্ধান। তাই ২০০৭ সালে ভারত 'অ্যাস্ট্রোস্যাট' নামে একটি উপগ্রহ পাঠাচ্ছে যার মূল উদ্দেশ্য হবে মহাকাশের শক্তিশালী রঞ্জনরশ্মির গবেষণা, যা হবে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আর সত্যি বলতে কি, চাঁদের পিঠের ছবি নানান ধরনের আলোর সাহায্যে তোলা হলেও, এখনও কেউ তার থেকে বিচ্ছুরিত শক্তিশালী রঞ্জনরশ্মির গবেষণা করেনি। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে তাই এটা হল একটা সুবর্ণ সুযোগ। কী ধরনের তথ্য আশা করা যেতে পারে এই গবেষণায়?

চাঁদে বেশ কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে যেগুলি তেজস্ক্রিয়তার দৌলতে শক্তিশালী রঞ্জনরশ্মি বিকিরণ করে। এই রশ্মি নিরীক্ষণ করে সেইসব পদার্থ শনাক্ত করা সম্ভব; এবং এইসব পদার্থ নিয়ে এখনও বিশদ গবেষণা হয়নি। যেমন রেডন আর ভারী সিসা—যার কথা আমরা আগেই জেনেছি চাঁদের বাষ্পীভূত পদার্থের চলাচলের ব্যাপারে। এই পদার্থগুলি শক্তিশালী রঞ্জনরশ্মি দিয়ে চেনা সহজ। শুধু এরাই নয়, আরও কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যেমন থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম নিয়েও গবেষণা করা যেতে পারে। যদি ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তাঁদের শক্তিশালী রঞ্জনরশ্মি নিরীক্ষণ করার যন্ত্রের সাহায্যে এই তথ্য জোগাড় করতে পারেন তাহলে সেটা হবে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এমন একটা পরীক্ষার পরিকল্পনা করেছেন ড. নরেন্দ্র ভাণ্ডারী, যিনি বহু বছর ধরে চাঁদ তথা সৌরমণ্ডলের অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করেছেন, এবং যাঁর ওপর 'চন্দ্রযান'-এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার ভার ন্যস্ত হয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'নাসা'-র বিজ্ঞানীরাও ১৯৯৮ সালে রেডন নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে তার থেকে বিকিরিত রঞ্জনরশ্মি দিয়ে নয়, তার থেকে নির্গত পদার্থকণার সাহায্যে। কিন্তু এমন পদার্থকণা সূর্য

থেকেও বেরিয়ে আসছে। তারা তাই সূর্যের থেকে আসা ও চাঁদের রেডন থেকে বেরনো কণা সব গুলিয়ে ফেলেছিলেন। ড. ভাণ্ডারীর মতে এ ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের রঞ্জনরশ্মির পরীক্ষা সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

অনেকে অবশ্য চাঁদের এমন কিছু খনিজের কথাও ভাবছেন (যেমন হালকা হিলিয়াম) যা ভবিষ্যতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে কাজে লাগবে। তবে ভারতে এই ধরনের গবেষণা এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়ে গেছে।

সব শেষে আসা যাক খরচের হিসাবে। উৎক্ষেপণযান, 'চন্দ্রযান' এবং দূর মহাকাশে যোগাযোগ করার জন্য একটি দূরবিন বানানোর খরচ মিলিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৩৮০ কোটি টাকার মতো। এর মধ্যে প্রায় একশো কোটি টাকার এই টেলিস্কোপ অবশ্য ভবিষ্যতেও কাজে আসবে—তাই 'চন্দ্রযান-১' পাঠানোর খরচ তিনশো কোটি টাকার কম ধরা যায়।

টাকার এই অঙ্ক শুনে তা ভারতের পক্ষে খুব বেশি বলে অনেকে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু আমরা অনেকেই ভুলে যাই যে ভারতের এক একটি উপগ্রহ তৈরি এবং উৎক্ষেপণ করতেও প্রায় একই ধরনের খরচ পড়ে, প্রায় কয়েকশো কোটি টাকার মতো। বরং, মনে হয় প্রায় একই খরচে চাঁদে মহাকাশযান পাঠিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার এই পরিকল্পনার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রশংসার্হ। আর যদি ভারতের দারিদ্র্যের কথা বলা হয়, তাহলে গরিব দেশ বলে তো আমাদের অন্য অনেক কিছু করা উচিত নয়। আমাদের দেশে নানান ছুতোয় যে বন্‌ধ ডাকা হয় তার জন্য ব্যবসায়ে ক্ষতির কথা আমরা কি মনে রাখি? মুম্বইয়ের মতন শহর একদিন 'বন্‌ধ' থাকলে ক্ষতি হয় প্রায় কয়েকশো কোটি টাকা। এ ছাড়া নানান কারচুপি-কেলেঙ্কারি তো রয়েইছে। শুধুমাত্র বিহারের পশুখাদ্যের জন্য যে হাজার কোটি টাকা তছনছ হয়েছে, তার সাহায্যে শুধু একটি নয়, কয়েকটি 'চন্দ্রযান' পাঠাতে পারতেন বিজ্ঞানীরা। আর আমাদের গরিব দেশে যাঁরা ধনী তাঁদের খরচের বহর দেখলে তো ভিরমি খেতে হয়। সম্প্রতি এক বাঙালি কোটিপতি তাঁর দুই ছেলের বিয়েতে সাড়ে তিনশো কোটি টাকা খরচ করেছেন। এইসব কাণ্ডকারখানা কি আমাদের দেশে মানায়? অন্য দিকে 'চন্দ্রযান'-এর পরিকল্পনা লজ্জাজনক তো নয়ই, বরং এর অনেক পরোক্ষ সুফলও রয়েছে।

'চন্দ্রযান' নিয়ে বেশির ভাগ বিতর্কে একটি প্রসঙ্গ এখনও তোলা হয়নি। সেটা হল নতুন প্রজন্মের ওপর এর প্রভাবের কথা। আমরা যখন আমাদের দেশের মেধাবী ছাত্রদের বিদেশে যাওয়া নিয়ে খেদ করি তখন আমরা দুঃখ করে বলি যে, আমাদের দেশে উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা করার সুযোগ নেই। আজকাল তো মেধাবী ছাত্ররা বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে পড়তেই চায় না। অথচ যখন সেই সুযোগ এনে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তখন আমাদের মনে হয় আমাদের গরিব দেশে এসব করে কী লাভ। মনে হয় এক ধরনের আত্মগ্লানিতে ভোগা, দুঃখবিলাসিতা করা আমাদের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

নিল আর্মস্ট্রং-এর চাঁদে পদার্পণ যে কীভাবে তখনকার ছেলেমেয়েদের— শুধু আমেরিকার নয়, সমস্ত পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের মনে দাগ কেটেছিল তা আমরা সবাই জানি। সত্যি বলতে গেলে এর ফলে সত্তরের দশকে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক গুণে বেড়ে যায়। নিল আর্মস্ট্রং-এর চাঁদে যাওয়াতে বিজ্ঞানের কতটুকু লাভ হয়েছে তা নিয়ে তর্ক করা যেতেই পারে, কিন্তু সেই ঘটনা যে অগুনতি মানুষের মনে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের মনে গভীর দাগ কেটেছিল সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আজ যাঁরা আমাদের দেশে মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁরাও ছাত্রজীবনে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'-র কথা শুনে

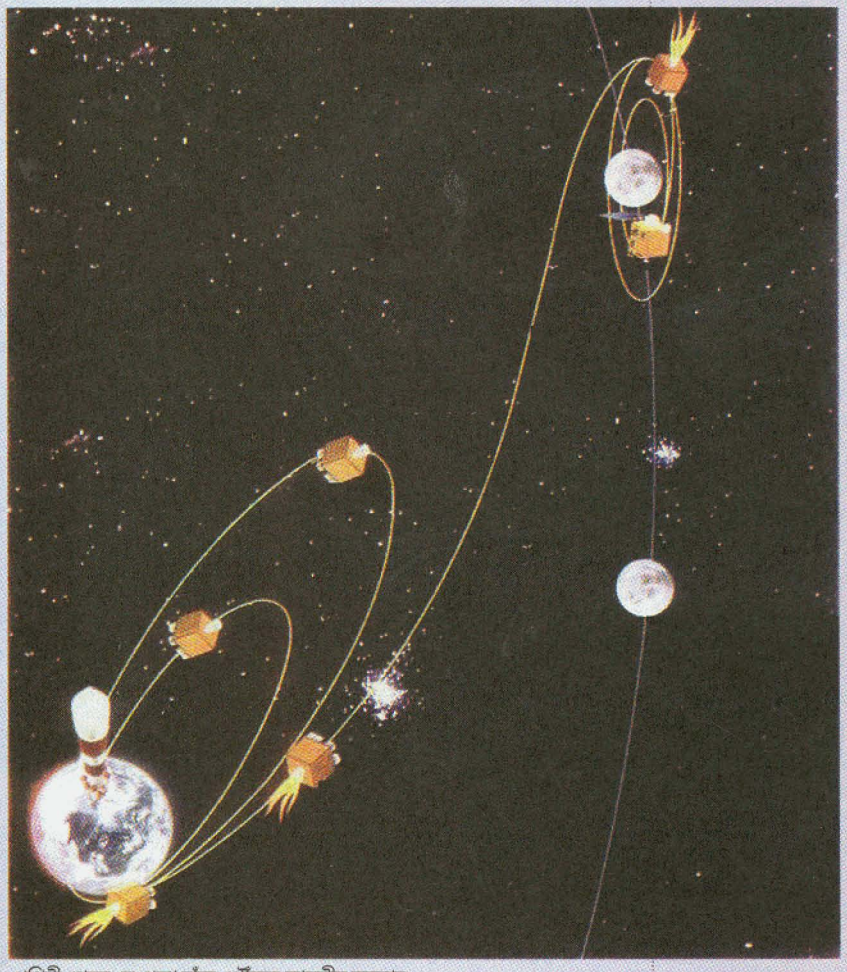

পৃথিবী থেকে যে-পথে চাঁদে পৌঁছবে ভারতীয় চন্দ্রযান

উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আমাদের জীবনে এমন কিছু প্রতীকী ঘটনারও প্রয়োজন রয়েছে— গাঁধীর লবণ আইন ভঙ্গের মতন— বিশেষ করে যদি তা 'চন্দ্রযান' পাঠানোর মতো একটি ঘটনা হয়, যা আমরা কয়েকটি 'বন্‌ধ'-এর পরিবর্তে সহজেই নিতে পারি। তা না নিলে পরবর্তী প্রজন্ম কি অদূরদর্শিতার জন্য আমাদের দায়ী করবে না?

তবে শুধু প্রতীকী হলেই চলবে না, ভারতের 'চন্দ্রযান' যদি সত্যিই চাঁদ নিয়ে গবেষণার এক নতুন জানালা খুলে দিতে পারে, তবেই তা সম্পূর্ণ সার্থক হবে। তার জন্য শুধু রঞ্জনরশ্মি বিশ্লেষণে দক্ষ হলেই চলবে না, এর জন্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদের শুধু একটি নয়, আরও কয়েকটি নতুন ধরনের পরীক্ষার কথা ভাবতে হবে। শুধুমাত্র একটি পরীক্ষার ওর নির্ভর করলে তাতে সাফল্য নাও আসতে পারে। আমরা আশা করব বিজ্ঞানীরা আগামী কয়েক বছরে তাঁদের পরিকল্পনাগুলি আরও খতিয়ে দেখবেন, যাতে 'চন্দ্রযান-১' সর্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

লেখক বাঙ্গালোরের রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জ্যোতির্বিজ্ঞানী

অন্যেরা তো ঠাট্টা করবেই— ভারতীয়দের কোনও রকমে নিরস্ত করতে না পারলে তো তাদের ব্যবসার ক্ষতি।